6

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 22 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আশ্রয় না হতে পারলে শিক্ষকতা ছাড়ুন

অভয় বাজে হৃদয় মাঝে

ওয়াহিদুল হক

আটই জুনের বৃদ্ধ হত্যা যেন কোন হত্যা নয়, শুধুই একটা সংবাদ, ঐ দিনে বিরোধী দল তথা বিএনপি'র হরতাল কেমন গেল, তৎসংশ্লিষ্ট। সেই অশীতিপর বৃদ্ধটি যেন কোন ব্যক্তি নয়, বাংলাদেশের নাগরিক নয়, নাগরিকমাত্রের কত অধিকার, তাঁর যেন কিছুই নেই। প্রকাশ্য রাস্তায় দুপুরের কিছু আগে জনাকীর্ণ পথে তাঁকে মধ্যযুগীয় পন্থায় ঢিল-পাটকেল ছুড়ে, যেন রসিয়ে রসিয়ে মারা হলো। একজন সচল সুস্থ মানুষকে ঢিল ছুড়ে মারতে গেলে কত ঢিল লাগে? কেমন ওজনের? ইটই ছুড়ে মেরেছে নিশ্চয়। মাথায় না পড়া পর্যন্ত তো কাবু হবার কথা নয়। মাথায় যখন ইট একটা পড়ল, তিনি কী করলেন? পড়ে গেলেন, খুব রক্ত ছুটতে আরম্ভ করল? তাতেই কি মারা গেলেন? না কি তখন লক্ষ্যবস্তু আর নড়াচড়া না করায়, যতক্ষণ বুড়ো শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ চলেছে খুবই অমোঘ, স্থির লক্ষ্যভাবে? তবু তো মৃত্যুযন্ত্রণা বলে একটা কিছু হয়েছিল তাঁর, প্রাণবায়ু নিশ্চয়ই এমনি-এমনি বেরিয়ে যায়নি। না যাবার জন্য নিশ্চয় শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে ছিল, শরীরটা তাঁর শেষ শক্তি দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকাতে চেষ্টা করছিল। মানুষের সারা জীবনের এই তো সর্বশক্তি, শ্রেষ্ঠ শক্তি। যখন তিনি তাঁর শরীর, শেষ যুদ্ধটি করছিল, তখনও গায়ে-মাথায় এসে পড়ছিল ইট। মরছে না কেন বুড়ো! তার পরে এক সময়ে সব শেষ।

সেই বৃদ্ধ ইমাম সাহেবকে বাঁচাবার জন্য কেউ ছিল না তাঁর পাশে, কেউ ছিল না তাঁর পৃথিবীতে। সমাজ বাঁচায় সুনীতি দিয়ে, সংস্কার দিয়ে। আইন বাঁচায় শাস্তির ভয় দেখিয়ে, দুর্নাম ও ঝামেলার ভয় দেখিয়ে। সরকার বাঁচায় সরাসরি পুলিশ দিয়ে। পাশবিক নিষ্ঠুরতায় বিচলিত হয়ে মানুষ এগিয়ে এসে বাঁচাতে পারত। এ সবের সব কিছুই মিথ্যা হয়ে গেল তাঁর জন্য। সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, বিচার নেই, মনুষ্যত্ব নেই। শুধু ঐ মুহূর্তের জন্য, মুমূর্ষু বৃদ্ধের চারপাশে কয়েক হাত জায়গার ভিতরে ঐ সব কিছুর লোপ হয়ে গেল? না আরও অনেক বড় জায়গা ধরে, বড় বড় সময় নিয়ে, বস্তুত সারা বাংলাদেশেই এবং অনেক বছর ধরেই ঐমতো সব কিছুর লোপ হতে থেকেছে, এবং হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ধরে চলেছে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ। প্রতিকারহীন, বিচারবিহীন, সমাজ-রাষ্ট্র-মনুষ্যত্ব সবকিছু বিলোপ নয় মাসের জন্য। পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর– স্বাধীনতার জনককে ঝাড়েবংশে হত্যা করল–– রাষ্ট্রপ্রধান সুরক্ষা পেলেন না রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর। এক প্রভাতী ফুৎকারে নিবে গেল দেশের সকল ব্যবস্থা, সকল মনুষ্যত্ব। অদ্ভুত এক তামসে ঘিরল সারা দেশকে, দেশের মানুষকে। সেই তামসে যেন দেশের শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক সজ্জন সৈয়দ আলতাফ হেঁটে গেলেন ছায়ার মতো লাশ ডিঙিয়ে প্রতিমন্ত্রিত্বের বন্দীদশায়, পিছনে ঘাতক। স্বাধীন বাংলার কারিগর তো অপর এক সজ্জন শিক্ষক ইউসুফ আলীও। তামসের অবগুণ্ঠনে তিনিও জুটলেন ঘাতকের সেবায়।

মানুষ জাগে সেই তমসার কাল থেকে। কিন্তু তামস গিয়েও যায় না। থেকে থেকেই এখানে-ওখানে সবখানে মানুষ মার খায়, মারা যায় বিনা প্রতিকারে, বিনা প্রতিবাদে। গণহত্যার মতো, পঁচাত্তরের মতো নির্বিচারে। এ্যাসিডে, চাপাতিতে, মেয়ে হলে ধর্ষণের পরে, পুরুষ হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পরে। কেউ গুলি খরচ পারতপক্ষে করে না। কেমন করে বাঁচে মানুষ, কেমন করে বাঁচবে? তাকে রক্ষা করবার কোনই ব্যবস্থা এদেশে কাজ করে না, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, জাতিগত, গোষ্ঠীগত, সমাজ সুনীতিগত। ফূর্তি তো একা জমে না, ধর্ষণের ফূর্তি তাই স্বাধীন বাংলায় গণধর্ষণে, হানাদার পাকিস্তানী জওয়ানের সাক্ষাত বংশধরেরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি শরীরের ওপর এবং ডবল সিরিয়্যাল। ফূর্তি শেষে ডবলফূর্তি, মেয়েটিকে হত্যা। আশ্চর্য, মেয়েটির বাবা আছে, াই আছে, আছে পাড়াপ্রতিবেশী। দেশের রাষ্ট্র রয়েছে, তার াইন রয়েছে, পুলিশ রয়েছে। কোন কিছুতে তাকে রক্ষা দিতে ারে না, দেয় না। হয়ত মানুষকে রক্ষা করবার দায় রাষ্ট্র এবং ার সকল প্রতিষ্ঠান দ্রুত ভুলে যাচ্ছে, সমাজ ও সমাজ থাকছে না ার সকল সুফল বন্ধন হারিয়ে।

থিবীর সব দেশের কথা ভাল জানি না, আমার দেশের কথাই কি ল জানি। যেটুকু জানি মনে রাখতে গেলে সেটুকুতেই পাগল য় যেতে হবে। সচ্ছল বয়স্ক মানুষদের প্রায় সবাই চোর, নানা পের নানা ধরনের। যার জন্য চুরি সেই সোনার টুকরা ছেলেরা া সবাই মস্তান-সন্ত্রাসী। বাপ-ব্যাটা সকলেই অন্য সকলের য়র ওপর দাঁড়াবার ধান্ধায় আছে, অস্ত্র দিয়ে বা না দিয়ে। বার একমাত্র উপায় হয়ে উঠছে পরের শ্রম চুরি– ক্যাপিটালিজম বাংলাদেশ স্টাইলে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে তার অংশ খাইয়ে আসতে হয় ব্যাংককেই। এ টাকা শোধ হবে শ্রম দিয়ে। যে ঋণ নিল তার শ্রম দিয়ে নাও হতে পারে–– সে তো গছাবে ভজাবে আর কাউকে। শর্টকার্ট রাস্তাও আছে। রক্ত-গরম অসহিষ্ণু যুবকেরা তার ওস্তাদ। ঋণ নিয়ে ফিরতি পথে ছিনতাই করে নিয়ে নিতে পারে টাকাটা। বাংলাদেশের বর্তমান সকল কর্মকাণ্ডের বস্তুত সম্পূর্ণ বাস্তবতাটারই নাম হতে পারে (সাম্প্রদায়িকতাসহ) পরের ধনে পোদ্দারি। যার ধন তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই। সবচাইতে বড় ধন প্রাণটুকু। যেকোন মুহূর্তে যে কোনভাবেই যেতে পারে তা। তার চাইতে বুঝি বড় ধন মান। তাও যখন তখন যেতে পারে, যাচ্ছেই তো অহরহ। আর ধন বলতে যে টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তি তার মতো অনিশ্চিত তো বাংলাদেশে কম জিনিসই আছে। এই সর্বময় নিরাপত্তাহীনতায় অনিশ্চয়তায় রাষ্ট্র সমাজ আইন সমস্ত কিছু সর্বরকম অর্থ তাৎপর্য ও কার্যকারিতা হারাচ্ছে। এবং রাষ্ট্র আর সমাজ তাদের প্রধান কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েও ঘাড় থেকে নামছে না। তারাও মানুষকে ঠেলছে, শুষছে, ঘাড়ে চেপে বসে থাকছে তো থাকছেই, সিন্দবাদের মামদো ভূত। মানুষ কোন সেবা পাচ্ছে না সমাজের কাছ থেকে, সমাজ তো ফতোয়াবাজের রক্ষণশীলের সমাজ, সুবিধাভোগীর সুবিধা অক্ষয় করবার সমাজ। মানুষ রাষ্ট্র থেকেও কোনই সেবা পাচ্ছে না, উল্টো শত প্রকারে রাষ্ট্রের কাছে জিম্মি হয়ে থাকছে। রাষ্ট্র এবং তার সৈন্যবাহিনী খুন করে, খুনীকে করে আড়াল। এবং মানুষকে বাধ্য করে রাষ্ট্রকে বহন করতে, জীবনের সবটা দিয়ে। মানুষের এই হতদশা, রাষ্ট্র নামের কবন্ধটির পচন প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঘুচবে, কবে ঘুচবে?

আনন্দমোহন কলেজ দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে সেদিন খুব ভাংচুর হলো। একেবারে বুয়েট স্টাইলে। সেখানকার ছাত্ররা এক পা বরং আগেই গিয়েছে, অধ্যক্ষকে ধমকেছে, উপাধ্যক্ষের বাড়ি চড়াও হয়েছে। বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত যে অস্ত্র, তাই প্রয়োগ করেছে আনন্দমোহন অধ্যক্ষ। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি। বুয়েটে ঠিক যেমনটা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবর যা হয়ে থাকে। কিন্তু ময়মনসিংহের এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটি বুয়েট ইত্যাদি ঘটনার একেবারে বিপরীত মূলগতভাবেই।

সেখানকার সকল আবাসিক ছাত্রকে চাঁদা গুনতে হয় সন্ত্রাসীর। তবে তারা থাকতে পায়। পড়তেও পায় বোধ করি। এটা নিয়ম। কাজল নামে রসায়ন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রটির ধার্য চাঁদা, এককালীন দু'হাজারের কিছু বেশি, সম্ভবত তার সাধ্যাতীত হওয়ায় সে দিতে চায় না। এই অপরাধে তাকে মারপিট আরম্ভ করে সন্ত্রাসীরা। কোথায়? হোস্টেলে? না। রাস্তায়? না। অধ্যক্ষের কক্ষে, তাঁর উপস্থিতিতে। কক্ষে আরও উপস্থিত উপাধ্যক্ষ, কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি, জিএস। সন্ত্রাসীদের বাধা দেওয়া, তাদের থামানো কারও পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কাজল মার খেতে খেতে চাঁদার অংশ দিতে স্বীকার করলে মৃত্যুপথ থেকে নিষ্কৃতি পায়। হোস্টেলের সকলে মিলে তখন এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কলেজ ভবনে ভাংচুর করে। উপাধ্যক্ষ হোস্টেলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের থাকবার ঘর দিয়েছেন, তারা সেখানে জামাই আদরে থাকে, আঃ বাঃ ফ্রি! তাই ছাত্ররা উপাধ্যক্ষের ওপর বিশেষভাবে বিরক্ত।

আশ্চর্য আমি ঘটনাটার চুম্বক লিখে ফেলতে পারলাম! পড়তে তো আমার অনেক সময় লেগেছিল। দীর্ঘ প্রতিবেদনের কোনও একটি বাক্যকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনের টুঁটি চেপে ধরে একটা একটা করে বাক্য গিলিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে আমাকে। অধ্যক্ষের উপাধ্যক্ষের সামনে তাদের ছাত্রকে পিটাচ্ছে বহিরাগত যুবকরা তাদেরকে ঢুকতে দিল কে? তাদেরকে বার করে দেয়া হলো না কেন? তাই বা কেন? তাদেরকে আটকে রেখে অধ্যক্ষ পুলিশে খবর দিলেন না কেন? পুলিশ এসে তাদেরকে ধরে নিয়ে গেল না কেন? যে ছাত্ররা পরে এত ভাংচুর করতে পারল তারা ঐ ঘটনার সময় সন্ত্রাসীদের ধরে জীবনের শিক্ষা দিতে পারল না কেন? এ কথা স্পষ্ট যে, সংবাদপত্র সব কথা লেখেনি। আমরা তা পড়ে যা জেনেছি তাতে অত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু আত্মমর্যাদা এবং পদমর্যাদা– অনার অব অফিস–– এখনও পর্যন্ত আমাদের মতো বুড়ো হাবড়াদের কাছে প্রত্যাশা করবার মতো জিনিস হিসাবে থেকে গেল। অধ্যক্ষ অর্থাৎ কলেজের মূর্তিমান কর্তৃপক্ষ তার ছাত্রকে রক্ষা করতে না পেরে কি গ্লানিতে ভুগছেন না? তাঁর অপমান লাগছে না? হারাকিরি করতেন হয়ত তিনি জাপানী হলে, বাঙালী হয়ে হয়ত অন্তত তিনি তো পদত্যাগ করতে পারতেন। কিংবা নিদেনপক্ষে বদলি হবার জন্য হত্যা দিয়ে পারতেন, কলেজে যাওয়া বন্ধ করতে পারতেন। ছাত্রছাত্রীর পুরো দায়িত্ব না নিতে পারলে তার কলেজে যাবার প্রয়োজনটাই কী থাকে?

যুক্তিবোধ বলে ঐমতো অবস্থায়ও যিনি পদ আঁকড়ে থাকেন, যিনি নিজের মর্যাদা তো বটেই, পদের মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে থেকেই যান, তিনি শিক্ষক যতটা তারও চাইতে অনেক বড় পলিটিশিয়ন। সরকার যেমন প্রেস নোট দেয় দিনকে রাত বানিয়ে, সকল সরকারই, তিনিও নিশ্চিয়ই ঐরকম কিছু একটা ভাষ্য দেবেন, পুরো ব্যাপারটাকে একেবারে উল্টো করে সাজিয়ে। কিন্তু আমি কিছুই প্রায় না জেনে এত দূর যেতে চাইছি না। আমার সহজ সরল প্রশ্ন, ছাত্র যদি শিক্ষকের কাছ থেকে আশ্রয় না পায়, তবে সেই শিক্ষকের প্রয়োজন কী? তিনি কি আদৌ শিক্ষক? যত জটিল হোক ঘটনা, এই প্রশ্নের সদুত্তর না দিয়ে পৃথিবীর কোন শিক্ষক পার পাবেন না, আনন্দমোহন অধ্যক্ষ তো সেখানে তুচ্ছ।

একটি প্রবণতা খুব চিন্তিত করে। সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিশদ প্রতিবেদন বেরিয়েছে। শুধু একটিমাত্র জায়গা যত্নসহকারে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। এই অস্পষ্টতা আসছে ব্যক্তির উল্লেখ না করে, সন্ত্রাসী শব্দের ব্যবহারে। নাম তো ট্যাবু হতেই পারে নানা কারণে, নাম নিলে যদি জীবন সংশয় হয় প্রতিবেদকের। হিন্দু সাধ্বী স্ত্রী নাম নেয় না পতিদেবতার, সুন্দরবনের উপান্তের মানুষ নাম নেয় না বাঘের, সর্পসংকুল এলাকায় সন্ধ্যার পর কেউ সাপকে সাপ বলে না। নাম না হয় নাই বলা গেল, আর কোনভাবে কি কোনই হদিস দেয়া যেত না। ঠাকুরগাঁয়ে তো প্রতিবেদক কেবল ছাত্রলীগের নামই করেনি প্রত্যেকের নাম করে গুণকীর্তন করেছে। আনন্দমোহনের সন্ত্রাসীরা কি সরকারী পক্ষের নিতান্ত চেনা যুবা পাণ্ডা, ছাত্রলীগ কিংবা যুবলীগের? না হলে ভয় কিসের? হলেই বা ভয় কিসের? বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় এই নতুন এক সংযোজন হলো, পিছনে যাবার নিশ্চিত লক্ষণ। সব খুন, সব ধর্ষণ করে হয় দুর্বৃত্ত দুষ্কৃতকারী, নয় সন্ত্রাসী। কোন ব্যক্তি বা কোন দল করে না। এই রকম নামকরণেই অর্ধেক অপরাধ কেটে যায়। সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাস করবেই। খুনী হত্যাকারী বিশেষণগুলো আজকাল আর ব্যবহৃত হয় না, তাতে যে ব্যক্তিকে বোঝায়, অপরাধের দায় চাপানো বোঝায়। আনন্দমোহনের জীবনের হুমকি দিয়ে টাকা আদায়কারী সংঘবদ্ধ যুবকরা চিরকালের গুণ্ডা। তাদের আর কেউ গুণ্ডা বলে না। যেন অনেক শিষ্ট ভাষা বলছি আজকাল। কেন? ঐ অপরাধীগুলোর সম্মানার্থে?

না, সম্মান ওদের প্রাপ্য নয়। সম্মানের পা ধুয়ে তারা পানি খাবে? তাদের দরকার একটিই জিনিসের। তাদের সমস্যাটা কেউ মমতা দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝুক। সমস্যাটা সংস্থানহীনতার। কর্মহীনতার আয়হীনতাহীন কঠিন দিনগুলো থেকে সহজ উত্তরণ পাওয়া যায় চরিত্রটি খোয়াতে রাজি হলে। তখন চাকরি-বাকরি ছাড়াই আয় আসে ঘরে। সবাই সমীহ করে করে ক্ষমতার স্বাদও দেয় সহজেই। সমাজ এবং সরকার বিরাটভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দায়িত্ব নেবার আগ পর্যন্ত মস্তানীর শেষ হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোও মনে হয় আরও অনেক দিন পর্যন্ত মস্তান বা সন্ত্রাসীকে আশ্রয় ও মদদ দিয়ে যেতে থাকবে নিজেদের স্বার্থে। রাজনীতিকদের যুবাশক্তির মধ্যে খুব কম লোকই আছে যে বুঝবে যুবকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না করলে, উপরন্তু সমস্ত নোংরা কাজের জন্য তাদের উপর নির্ভর করা না ছাড়লে–– রাজনীতির কোন উপকার হবে না, দেশের কোনই উদ্ধার হবে না মস্তানতন্ত্রের কবল থেকে এবং সবচাইতে দুরবস্থা হবে এই স্বাধিকারপ্রমত্ত যুবকদের। তারা কেউই চল্লিশ পেরোবে না। সুস্থ-সুখী জীবন পাবে না। ভয়ের এবং অনিশ্চয়তার জীবন হবে তাদের।

আসুন আমরা সকলে নিজেকে নয় আমাদের দায়িত্বের মধ্যে যে তাকে রক্ষা করি, জীবন দিয়ে হলেও। একদিন মোড় ফিরবেই এই তমসার কাল।